একটু দাঁড়িয়ে যাও

সংকলন : সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক :
বলরাম ঠাকুর

প্রকাশকাল : ১২ জানুয়ারি, ২০১৩
দ্বিতীয় : মহালয়া, ২০১৭
তৃতীয় : জন্মাষ্টমী, ২০১৯

মুদ্রক :
নিউ ভারতী
বিধান সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সহযোগ রাশি : কুড়ি টাকা মাত্র

একটু দাঁড়িয়ে যাও

মস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার মস্ত বড় অধিকারী শ্যামাপদবাবু। প্রচণ্ড ব্যস্ত তাঁর জীবন। দিনের মধ্যে ১৬ ঘন্টা কাজ করেন। দিনের প্রতিটা মিনিট তিনি চলেন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। নিতান্ত সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের পরিশ্রমে নিষ্ঠায় আজ তিনি এত উঁচু জায়গায় পৌঁছেছেন। নিজের পরিচিত মহলে তিনি এস. পি সাহেব নামেই পরিচিত। তিনি নিজেও তার পিতৃদত্ত শ্যামাপদ নামটি ভুলতে বসেছেন।

সেই ব্যস্ত এস. পি সাহেব একদিন সকালে তার সদ্য কেনা দামি গাড়ি চড়ে খুবই দ্রুত গতিতে চলেছেন তাঁর কোম্পানির জ(রী মিটিংয়ে যোগ দিতে। ব্যস্ত তিনি, সময় তার কাছে খুবই মূল্যবান।

ফাঁকা রাস্তা, শুধু গাড়ি চলেছে সেই রাস্তায়। কারোর কাছেই সময় নেই, সবাই চলেছে তাই দ্রুত। সবাই আগে যেতে চায়। প্রথমে পৌঁছতে চায়। হঠাৎই একটা ইট এসে লাগে এস. পি সাহেবের দ্রুত চলা গাড়ির কাচে। ফেটে চৌচির হয়ে যায় দামী গাড়ির পাশের জানালার কাচ। প্রচণ্ড শব্দ তুলে গাড়ি দাঁড় করান সাহেব। তারপর যেখান থেকে ইট এসেছিল গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে সেখানে এসে, প্রচণ্ড রেগে, গাড়ি থেকে নেমে আসেন। গাড়ির অবস্থা দেখে (োভে, রাগে ফেটে পড়েন তিনি। দেখেন, তার সামনে ৭-৮ বছরের একটি শিশু হাতে ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

রাগে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে এস. পি সাহেব শিশুটির চুলের মুঠি ধরে গাড়ির গায়ে চেপে ধরেন, 'দেখ, দেখ কি করেছিস তুই। আমার নতুন দামি গাড়ির কি অবস্থা করেছিস। জানিস কত দাম এই গাড়ির! কেন, কেন তুই ইট ছুঁড়লি।' চিৎকার করেন এস পি সাহেব।

দুটি অসহায় চোখ তুলে শিশুটি এস পি সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে গাল ভিজে যায়।

'কেন তুই ইট ছুঁড়ে গাড়ির কাচ ভাঙলি?' অনেকটা নরম সাহেবের গলা।

শিশুটি কান্নাভেজা গলায় বলে, 'কি করব বল, সেই কখন থেকে সব গাড়িকে হাত দেখাচ্ছি, কিন্তু কেউ থামছে না। তাইতো তোমাকে থামাবার

জন্য ইট ছুঁড়লাম।' আবার চিৎকার করে ওঠেন এস পি সাহেব— 'কেবল মাত্র থামাবার জন্য ইট ছুঁড়লি। কিন্তু কেন?'

'জান, সেই অনেক(ণ আগে রাস্তায় যেতে যেতে আমি আর আমার ভাই ওই বড় ড্রেনটায় পড়ে গিয়েছিলাম। আমি ড্রেন থেকে উঠতে পেরেছি, কিন্তু আমার ভাই এখনও ওই ড্রেনটায় পড়ে আছে। আমি তুলতে পারিনি, তাই তো তখন থেকে চেষ্টা করছি গাড়ি থামাবার। কিন্তু কেউ থামছে না। আমার ভাই ড্রেনের মধ্যে থাকলে মরে যাবে। কাতর কণ্ঠ শিশুটির।'

'চল তো দেখি'-- বলেই এস. পি সাহেব দৌড়ে যান শিশুটির দেখানো ড্রেনটির দিকে। শুনতে পান অসহায় এক শিশুর কান্না। নিজের পদমর্যাদা, দামি পোষাক সব কিছু ভুলে দু-হাতে কোলে তুলে নেন শিশুটিকে। নিজের গাড়ির থেকে জল তোয়ালে বার করে ধুয়ে মুছে দেন শিশুটিকে, তারপর তার দাদার কোলে তুলে দেন।

'তুমি না থাকলে আমার ভাই মরে যেত'-- বলে ওঠে শিশুটি।

'কোথায় থাকিস তোরা?' জানতে চান সাহেব।

'ওই হোথা', দূরের এক বস্তির দিকে হাত দেখিয়ে শিশুটি ভাইকে কোলে নিয়ে হাসিমুখে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

ক্লান্ত এস. পি সাহেব নিজের গাড়ির কাছে ফিরে আসেন, তাকিয়ে থাকেন ভাঙ্গা জানালার দিকে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন এই কাঁচ তিনি কখনও সারাবেন না। এই ভাঙ্গা জানালাটি তাকে মনে করিয়ে দেবে **কিসের এত ব্যস্ততা, তোমার সাহায্যের জন্য কত অসহায় মানুষ অপে(া করে আছে। তাদের যেন আর কখনও ইট ছুঁড়ে তোমাকে থামাতে না হয়।**

শি(া

সফল ব্যবসায়ী বাদলবাবুর একমাত্র সন্তান সজল। ধনী বাদলবাবুর মনে আশা ছিল, সজল পড়াশোনা করে ডাক্ত(ার-ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপক হোক, আর তার জন্য তিনি সব রকমের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সজলের লেখাপড়ার প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো ও বিভিন্ন ভাবে ধনী পিতার অর্থ অপচয় করাই তার প্রধান কাজ। তৃতীয় বারের চেষ্টাতেও যখন সজল মাধ্যমিক পাশ করতে পারে না, বাদলবাবু সজলকে পড়াশোনা বন্ধ করে কোনও

কাজের খোঁজ করতে বলেন। সজলের মা বাদলবাবুকে বলেন, ছেলেকে তার নিজের ব্যবসায় বসাবার জন্য। কিন্তু বাদলবাবু রাজি নন। তিনি বলেন, আগে নিজের চেষ্টায় তার ছেলে কিছু অর্থ উপার্জন করে প্রমাণ ক(ক সে ব্যবসায় বসার উপযুক্ত(। সজলের মা জানতে চান, কত টাকা তাকে উপার্জন করে দেখাতে হবে! বাদলবাবু বলেন, কমপ(হাজার টাকা সজল উপার্জন করে তার হাতে জমা ক(ক।

মা একথা সজলকে বলেন। রাজি হয় সজল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও সে কোনও কাজ পায় না, কারণ, কাজ পাওয়ার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন তা তার নেই। ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য কখনও পরিশ্রম করেনি, ফলে পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না। লেখাপড়া শেখেনি, ফলে গৃহশি(কতা করার যোগ্যতাও তার নেই। হতাশ সজল মায়ের কাছে ভেঙ্গে পড়ে। মা সজলকে বলেন, 'দেখো, তোমাকে আমি ৫০০ টাকা দিচ্ছি। তুমি একথা কাউকে বলবে না। বাবাকে গিয়ে বল যে, তুমি এই টাকা রোজগার করেছ।'

পরিকল্পনা মতই বাবার বাড়ি ফেরার প্রতী(ায় ছিল সজল। সন্ধ্যায় বাদলবাবু বাড়ি ফিরতেই সজল ৫০০ টাকা এগিয়ে দেয় বাবার দিকে। বলে— আমার উপার্জনের ৫০০ টাকা। বাদলবাবু কোনও কথা না বলে ৫০০ টাকার নোটটি নিয়ে উনানের মধ্যে ফেলে দেন। নিমেষের মধ্যে ছাই হয়ে যায় টাকাটা। অবাক সজল উঠে চলে যায়। বাদলবাবুও কোনও কথা না বলে নিজের কাজে মন দেন।

কয়েকদিন পর আবার মা ও ছেলে পরিকল্পনা করে। আবার মায়ের দেওয়া ৫০০ টাকা বাদলবাবুর হাতে তুলে দেয় সজল। যথারীতি বাদলবাবু তা আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দেন। হতাশ সজল বুঝতে পারে না, তার ভুল কোথায়। সে চুপচাপ দেখতে থাকে বাবার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। তার কৃপণ বাবা একটাকাও অপচয় করেন না, কিন্তু তার দেওয়া টাকাগুলি কেমন অক্লেশে আগুনে ফেলে দেন, তা তার মাথায় ঢোকে না। মা তাকে সাহস দেন আবার টাকাও দেন। কিন্তু তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটে। বাদলবাবু টাকা নিয়ে সোজা আগুনে ফেলে দেন। অবাক সজল দেখতে থাকে। তার সামনে ৫০০ টাকা ছাই হয়ে যায়। জেদ চেপে যায় সজলের। পরদিনই সে কাজ যোগাড় করে ফেলে। খবরের কাগজ বিত্রি(। যে ছেলে সকাল ৯টার আগে বিছানা ছাড়ত না সে ভোরে উঠে স্টেশনে যায় কাগজ আনতে। প্রতিদিনই তা ল(্য করেন বাদলবাবু, কিন্তু ছেলেকে কোনও

কথা বলেন না তিনি। এক মাস পরে হিসাব করে সজল দেখে, মাসে তার আয় হয়েছে ৬০০ টাকা। খুশি মনে সেই টাকা সে তুলে দেয় বাবার হাতে, বলে— আমার এক মাসের উপার্জন এই টাকা।

বাদলবাবু যথারীতি সেই টাকা ছুঁড়ে ফেলেন উনানের মধ্যে, কিন্তু প্রস্তুত সজল ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকটা নোট তুলে আনে আগুনের মধ্যে থেকে। কয়েকটি নোটের সঙ্গে তার হাতও পুড়ে যায় কয়েক স্থানে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সজল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে— 'আমার গত এক মাসের পরিশ্রমের টাকা তুমি এভাবে ফেলে দিলে! জানো, প্রতিদিন ভোর ৪টায় উঠে আমি কাগজ বিত্রি(করে কত কষ্টে এই টাকাগুলো রোজগার করেছি, আর তুমি তা আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছিলে।' কাঁদতে থাকে সজল। মা এসে সজলকে ভোলাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সজল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে।

এদিকে এসব কাণ্ড দেখে বাদলবাবু হাসতে থাকেন। তা দেখে সজল আরও ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু বাদলবাবু বলেন, সজল আজ থেকেই তুমি আমার সঙ্গে আমার ব্যবসাতে বসবে। অবাক বিস্ময়ে সজল আর সজলের মা বাদলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাদলবাবু বলেন— 'আজ তুমি বুঝতে পেরেছ পরিশ্রমের রোজগার নষ্ট করে দিলে কত কষ্ট হয়। যে সম্পদ বিনা পরিশ্রমে ঘরে আসে মানুষ তার মর্যাদা বোঝে না, তার যথেষ্ট মূল্য দেয় না। কিন্তু যখন সে পরিশ্রম করে উপার্জন করে, একমাত্র তখনই মানুষ বুঝতে পারে, পরিশ্রমের মূল্য ও মর্যাদা। তার উপার্জনের সঙ্গে তার ঘাম, শ্রম, সময় মিশে থাকে। আজ তুমি সেই সত্যটা অনুভব করতে পেরেছ। যার জন্য আমি এতদিন অপে(া করছিলাম।'

প্রকৃত পে(বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে, বিনা চেষ্টায় যে সম্পদ মানুষের হাতে আসে মানুষ তার সঠিক মূল্য বোঝে না। ব্যক্তি(যত কঠোর পরিশ্রম করে ততই সফলতা পায়, আর যত বেশি সফলতা পায় তত বেশি পরিশ্রম করে। সবথেকে ভালো বিচারও কোনও কাজের হয় না, যত(ণ না তার ব্যবহার হয়। পরিশ্রম ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি(ছাড়া শ্রেষ্ঠ প্রতিভাও কোনও মর্যাদা পায় না।

অনুভব

কুকুর পোষার শখ ছোট্ট অনুভবের, কিন্তু কুকুরে বাবার প্রবল আপত্তি। কারণ অনুভব পড়াশোনা ছেড়ে কুকুর নিয়ে সময় নষ্ট করবে আর তার লেখাপড়া যাবে গোল্লায়। কিন্তু অনুভবের বায়নার কাছে হার মানতে হয় বাবাকে। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে বাবা শর্ত দেন অনুভবকে— ''যদি ক্লাসে প্রথম হতে পারো তবেই তোমাকে কুকুর কিনে দেওয়া হবে।'' বাবার শর্ত মেনে নেয় অনুভব। অবশেষে প্রতী(ার অবসান হয়। বাবাকে অবাক করে ক্লাসে প্রথম হয় অনুভব।

মায়ের সঙ্গে বাজারে এসেছে সে। বড় দোকান থেকে নিজে পছন্দ করে নরম উলের গোলার মতো তুলতুলে, ধপধপে একটা কুকুর কিনবে। রাজি হয়ে বাবা অফিস যাবার সময় মাকে টাকা দিয়ে বলে গেছেন, কোন দোকানে যেতে হবে। দোকানে অনেক পশুপাখী বিক্রি(হচ্ছে, অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছে অনুভব। কত রকমের কুকুর, কত রংয়ের, কত জাতের, দেশী বিদেশী। হরেক রকম নাম তাদের। মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এসব দেখতে দেখতে তার স্বপ্নের কুকুরের খাঁচাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় অনুভব। অবাক হয়ে দেখতে থাকে নরম পশমের বলের মতো ছোট ছোট কুকুর ছানাগুলিকে। অনেকগুলি এক সঙ্গে খেলা করছে, কিন্তু একটা ছোট বাচ্চা এক কোণে একা বসে জুলজুল করে তাকিয়ে দেখছে অনুভবকে। কুকুরটাকে দেখে বড় মায়া হয় অনুভবের, মনে হয়, যেন তাকে কিছু বলতে চাইছে কুকুরছানাটা। বিক্রে(তার অনুমতি নিয়ে ছোট্ট ছানাটাকে কোলে তুলে নেয় সে, তার গায়ে নিজের গাল ঘষে দেয়। আনন্দে কুকুরছানাটা নিজের জিভ দিয়ে গাল চেটে দেয় অনুভবের। মনে মনে ঠিক করে অনুভব, এই বাচ্চাটাই নেবে সে। বিক্রে(তাকে জানায় সেকথা। কিন্তু বিক্রে(তা বলেন 'ঐ কুকুর ছানাটা ছাড়া অন্যগুলোর মধ্যে একটা পছন্দ কর, ওটা বিক্রি(নেই।' 'না আমি এটাই নেব।' বলে অনুভব। বিরক্ত(হন বিক্রে(তা— 'আরও এতগুলো কুকুরছানার মধ্যে যে কোনও একটা তুমি নাও। ওটাকেই কেন চাইছো তুমি?'

'না এটাই নেব আমি'— জেদ করে বলে অনুভব। 'আরে দেখছো না, ওই বাচ্চাটার একটা পা জন্ম থেকেই খোঁড়া। তাই ওটাকে আমরা বিক্রি(করছি না, তুমি আর যে সুস্থ সবল বাচ্চাগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা নাও। কেন পয়সা দিয়ে খোঁড়া কুকুর কিনবে?' অনুভবকে বোঝাবার চেষ্টা করেন বিক্রে(তা।

'এই কুকুর ছানাটা বিক্রি(হবে না, তবে এটাকে তোমরা কি করবে?' জানতে চায় অনুভব। বিক্রে(তা উত্তর দেন 'কি আর করব, ওটাকে মেরে পুঁতে দেওয়া হবে। কারণ কেউ তো আর পয়সা দিয়ে পঙ্গু কুকুর কিনে নিয়ে যাবে না।' 'তবে তো আমি এটাই কিনব'— আরও জেদী সে। আবার তাকে বোঝাতে চান বিক্রে(তা। ইতিমধ্যে দূর থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে মা এসে পড়েছেন। তিনি জানতে চান বিক্রে(তার কাছে, 'ব্যাপারটা কি?'

'দেখুন ম্যাডাম, আপনার ছেলের বোকামি, পয়সা দিয়ে একটা খোঁড়া কুকুর কেনার জন্য জেদ করছে। অনেক ভাল ভাল কুকুরছানা থাকতেও ও খোঁড়া কুকুরছানাটাই কিনতে চাইছে। আপনার ছেলেকে একটু বোঝান।'

'ওকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। ও যেটা চাইছে সেটাই ওকে দিন'— বিক্রে(তাকে আরও আশ্চর্য করে উত্তর দেন মা।

হতভম্ব বিক্রে(তা উত্তর দেন, 'কিন্তু ম্যাডাম দাম আমরা কমাতে পারব না। অন্যগুলোর সমান দামই দিতে হবে।'

চাহিদা মতো মূল্য মিটিয়ে পাশের দোকানের দিকে এগিয়ে যান মা, অনুভবকেও পাশের দোকানে আসতে বলেন।

কুকুর ছানাটিকে অনুভবের হাতে তুলে দেন বিস্মিত বিক্রে(তা, আনন্দিত অনুভব বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে হাঁটতে থাকে মায়ের পিছনে।

'ও ভাই, শোন'— ডেকে ওঠেন বিক্রে(তা ভদ্রলোক।

ফিরে তাকায় অনুভব।

'একটা প্র(ছিল। এত ভাল কুকুর থাকতে কেন এই পঙ্গু কুকুরছানাটা কিনলে সেটা বুঝতে পারলাম না!'

অনুভব কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে নিজের ফুলপ্যান্টের ডান পাটা গোটাতে থাকে, অবাক বিস্ময়ে দেখেন বিক্রে(তা, অনুভবের ডান পাটাও হাঁটুর নীচে থেকে নেই।

'আমি বুঝতে পেরেছি, সব বুঝতে পেরেছি'— সজল চোখে উত্তর দেন বিক্রে(তা। চলে যায় অনুভব। ভাবতে থাকেন বিক্রে(তা, **আমাদের সকলের মধ্যে যদি সমাজ সম্পর্কে, সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য এমন অনুভব থাকত, তবে এই সমাজও নিশ্চয়ই স্বর্গে পরিণত হত।**

বিশ্বাস

হরিহর আত্মা বলতে যা বোঝায় অজয় আর সুজয় দুজনে তাই। ভীষণ বন্ধুত্ব দুজনের, শিশুকাল থেকেই। একই গ্রামের, একই পাড়ায় দুজনের বাড়ি। একই স্কুলের, একই শ্রেণীতে দুজনার পড়াশোনা। সাঁতার, ফুটবল, কাবাডি, ঘুড়ি ওড়ানো, সব কিছুতেই দুজনে একত্রে। যেখানে অজয় সেখানেই সুজয়। অজয়ের বাড়িতে মা ভালো রান্না করলে সুজয়ের নিমন্ত্রণ, সুজয়ের বাড়ি আত্মীয় মিষ্টি আনলে তার ভাগ অজয় পাবেই। এই ভাবেই বেড়ে উঠেছে দুজনে। মাধ্যমিকের পর দুজনেই দূরের শহরে উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ভর্তি হয়েছে। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে তারা, কি হবে বড় হলে। লেখাপড়াতে আহামরি কিছু নয়, তবে কি চাকরি পাবে? কিন্তু এটা ঠিক করেছে দুজনে— যে চাকরিই ক(ক না কেন দুজনে একসঙ্গে একই চাকরি করবে।

উচ্চ মাধ্যমিকও শেষ হয়েছে, হাতে অখণ্ড অবসর। কিন্তু দুশ্চিন্তাও অনেক। এরপর কি করবে? পরী(ার ফলই বা কি হবে? একদিন সকালে অজয় ছুটতে ছুটতে আসে সুজয়ের বাড়ি। — ''সুজয় তৈরি হয়ে নে, এখুনি যেতে হবে। আমাদের কাছে এমন সুযোগ আর আসবে না।'' এক নিঃশ্বাসে বলে যায় অজয়।

— ''কিসের সুযোগ অজয়? কোথায় যেতে হবে? আর কেনই বা যেতে হবে''— প্র(সুজয়ের।

— ''আরে বলছি তো, আমাদের এক আত্মীয় কাল রাত্রে খবর পাঠিয়েছে। সেনাবাহিনীতে লোক নিচ্ছে, আমরা যদি আজকেই ওখানে যাই তবে আমাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার ব্যবস্থা হতে পারে।''

— ''সত্যি! সেনাবাহিনীতে, কি দা(ণ খবর রে! আমাদের কতদিনের আশা বল! আমরা এক সঙ্গে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে দেশমায়ের সেবা করব, প্রয়োজনে নিজেদের জীবন দিয়ে মায়ের সম্মান রাখব''— বলতে বলতে সুজয়ের গলা ধরে আসে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ রওনা দেয় জেলা শহরের দিকে। আর কি আশ্চর্য, দুজনেই নির্বাচিত হয় সেনাবাহিনীর নির্ধারিত প্রশি(ণের জন্য।

প্রশি(ণের পর দুজনে একই ব্যাটেলিয়নে যোগ দেয়। রওনা হয় কর্মস্থলের দিকে। ধীরে ধীরে কেটে যায় কয়েকটা বছর। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়নি একবারও, যদিও কয়েকবারই কর্মস্থলের পরিবর্তন হয়েছে।

লড়াই শু(হয়েছে, সীমান্তে রয়েছে অজয় আর সুজয়। এক রাত্রে, শত্রু কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলির অবিশ্রাম বর্ষণ চলছে। বাইরে ডিউটি রয়েছে অজয়ের। সুজয় রয়েছে ট্রেঞ্চের মধ্যে। হঠাৎ ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে সুজয় শুনতে পায় কে যেন বাইরে থেকে তার নাম ধরে ডাকছে— ''সুজয়, সুজয়, তুই কোথায়..... আমাকে সাহায্য কর।''

সুজয় বুঝতে পারে, অজয় নিশ্চয় কোনও বিপদে পড়েছে। বাইরে বের হতে যায় সুজয়, কিন্তু বাধা দেন কমাণ্ডার। ''কোথায় যাচ্ছ সুজয়, দেখছো না বাইরে অবিশ্রাম গুলি বর্ষণ হচ্ছে! এখন বাইরে গেলে তুমি মারা পড়বে।''

— ''কিন্তু স্যার, অজয় কোনও বিপদে পড়েই আমার সাহায্য চাইছে। আপনি আমাকে যাবার অনুমতি দিন।''

— ''আমি তোমাকে আত্মহত্যা করার অনুমতি দিতে পারি না। গুলি থামা পর্যন্ত অপে(া কর, থামলে যাবে।''

— ''কিন্তু স্যার''-- বলে সুজয়।

— ''চুপ কর''-- চিৎকার করে ওঠেন কমাণ্ডার। পরে আবার শুনতে পায় সুজয় অজয়ের ক(ণ ডাক— ''সুজয়, সুজয়, তুই কোথায়! আমাকে বাঁচা।''

আর থাকতে পারে না সুজয়। কমাণ্ডারের পা জড়িয়ে ধরে, অনুমতি চায় বাইরে যাওয়ার। বিহ্বল কমাণ্ডার রাজি হন, সাবধানে যেতে বলেন তাকে।

নিঃশব্দে কিছু(ণ কাটে, হামাগুড়ি দিয়ে ফেরে সুজয়। টানতে টানতে সঙ্গে আনে অজয়ের মৃতদেহ। সকলে নীরবে চেয়ে থাকে অজয়ের (তবি(ত দেহের দিকে। কমান্ডার বলেন,— ''দেখ তুমি কত বড় ভুল করেছিলে। অজয়ের মৃত্যু হয়েছে, তোমারও হতে পারত। এখনই বাইরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না তোমার।''

''আমি কোনও ভুল করিনি স্যার, আর যাবারও প্রয়োজন ছিল আমার।'' কান্নাভেজা গলায় বলে সুজয়। আমি যখন অজয়ের পাশে পৌঁছেছিলাম তখনও বেঁচে ছিল অজয়। স্যার, অজয়ের শেষ কথা ছিল— ''আমি জানতাম সুজয়, তুই আসবি, আমার বিশ্বাস ছিল যত গুলিই চলুক তুই আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নিশ্চয় আসবি।''

''আমি অজয়ের বিশ্বাস রাখতে পেরেছি স্যার, আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি।'' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুজয়। সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে চলতে থাকে অবিশ্রাম গোলাবর্ষণ।

প্রেরণা

ফুটবল-অন্ত প্রাণ বাবুর। পড়াশোনার সময়টুকু বাদ দিলে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ফুটবল নিয়ে মত্ত। বাবার বকুনি, মায়ের শাসন কোনও কিছুতেই পরোয়া নেই তার। প্রতিদিন স্কুলের ছুটির পর বুট জার্সি নিয়ে মাঠে হাজির হওয়া চাই। মাঠে যাওয়ার তার আরও বড় কারণ হল নতুন ড্রিল স্যার পুণ্যবাবু। মাত্র কিছুদিন হল এসেছেন। এসেই সব ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গিয়েছেন। স্যার আসার পর এই স্কুলের ফুটবল টিম এখন জেলার সেরা স্কুল টিমগুলোর একটা হয়ে উঠেছে। আরও অনেক ছেলের সঙ্গে বাবুও রোজ স্যারের কাছে ফুটবল শিখতে যাচ্ছে। তিনিও তাঁর সব কিছু উজাড় করে ছাত্রদের শেখাচ্ছেন। নিজের মাইনের বেশির ভাগ অংশটা তিনি ছাত্রদের জন্য ব্যয় করে দেন।

শু(হয়েছে ইন্টার স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা। সেজন্য বাবুদের স্কুলেও টিম তৈরি হয়েছে। আঠারো জনের টিম, অনেক ভেবেচিন্তে আলোচনা করেই স্যার দল নির্বাচন করেছেন। এই আঠারো জনের দলে ঠাঁই পাবার জন্য ছাত্ররা চরম পরিশ্রম করেছে, কিন্তু সেরা খেলোয়াড়রাই দলে নির্বাচিত হয়েছে। বেশির ভাগই বাদ পড়েছে। বাবুও আছে বাদ পড়ার দলে। কিন্তু হলে কি হবে, প্রবল উৎসাহে বাবার হাত ধরে সেও যাচ্ছে স্কুলের প্রতিটা ম্যাচ দেখার জন্য।

সে একা নয়, গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষই তাদের স্কুলের খেলা দেখতে হাজির হচ্ছে। বাবুরও খুব ইচ্ছে করে স্কুলের টিমের হয়ে খেলতে। কিন্তু কি ভাবে খেলবে! সে তো অন্যদের মতো অত ভালো খেলতে পারে না। ক্যাবলার ডিফেন্স, বালকের ড্রিবলিং, অলোকের স্পীড— কিছুই তো নেই তার।

একটার পর একটা ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছে তাদের রূপপুরের সাগরচন্দ্র স্কুল। ফাইনাল খেলা। সকাল বিকাল প্র্যাকটিস করে চলেছে সবাই। শি(ক ছাত্রদের মধ্যে তার জন্য প্রবল উত্তেজনা।

আজ ফাইনাল ম্যাচ। সমস্ত মাঠ লোকে লোকারণ্য। তাদের স্কুল আর অন্যান্য স্কুলের ছেলে ও গ্রামের মানুষ মিলে মাঠে তিল ধারণের স্থান নেই। ফাইনালের দু-দল ড্রেসিং(মে, দুটো ক্লাস(মকেই ড্রেসিং (ম করা হয়েছে। কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর আজ আবার বাবু এসেছে মাঠে। স্কুল প্রথমবার ফাইনাল খেলবে, সেই উত্তেজনায় ক'দিন তার অনুপস্থিতি কেউ তেমন ল(্য করেনি। তাছাড়া সে তো নিয়মিত পে-য়ারও নয়। আজ কিন্তু বাবু তার জার্সি

বুট সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আর এসেই দেখা করেছে স্যারের সঙ্গে। তার দাবি শুনে স্যার আশ্চর্য হয়ে গেছেন। বাবু বলেছে, 'আজ ফাইনালে তাকে খেলাতে হবে।' স্যার বলেন, 'তা কি করে সম্ভব! তুমি কখনও ম্যাচ খেলোনি, তাছাড়া তোমার থেকে অনেক অনেক গুণ ভালো খেলে যারা, তাদের নিয়ে টিম তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে বসানো সম্ভব নয়। তুমি এমন অনুরোধ কোরো না।' স্যারের পা জড়িয়ে ধরে বাবু। মন ভিজে যায় পুণ্যবাবুর। তিনি বলেন, 'দেখ, আমি আমার নিজের সিদ্ধান্তের বি(দ্ধে তোমাকে খেলাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখো, প্রথম পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তুমি কিছু করতে না পারলে তোমাকে তুলে নেওয়া হবে।'। রাজি হয়ে যায় বাবু। মাঠে বাবুকে নামতে দেখে গোটা স্কুল তাজ্জব হয়ে যায়। কিন্তু স্যারের সিদ্ধান্তের বি(দ্ধে কেউ কোনও কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ শু(করে অনেকে।

টসের পর কিক অফ— বল বাবুদের সীমানার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বিপ(দল চেপে ধরেছে বাবুদের। হঠাৎই ক্যাবলার ক্লিয়ার করা একটা বল প্রায় মাঝ মাঠে দাঁড়ানো বাবুর পায়ে এসে পড়ে, আর বল ধরে জ্যা মুক্ত(তীরের মতো ছোটা শু(করে বাবু। শেষ করে অন্য দলের গোলের মধ্যে ঢুকে। উল্লাসে ফেটে পড়ে সমস্ত মাঠ। তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় তার সতীর্থরা।

একা বাবুকে আটকাতেই তিনজন পে-য়ারকে লাগিয়েছে বিপ(কোচ আর আবাক বিস্ময়ে বাবুর খেলা দেখছেন পুণ্যবাবু। খেলা শেষ হয়, বাবু ছুটে গিয়ে স্যারকে প্রণাম করে। সবাই বাবুকে একটু ছুঁতে চায়। সাবাস দিতে চায়। বাবুকে আলাদা ডেকে নিয়ে স্যার বলেন, 'আমার জীবনের সব থেকে বড় ভুল আজকে আমি করতাম, যদি তোমাকে না খেলাতাম। তুমি এত ভালো খেল, কিন্তু কখনও আমি তা বুঝতে পারিনি। তোমার মতো পে-য়ারকে আমি বসিয়ে রেখেছিলাম!'

বাবু বলে, 'স্যার আজকে আমার বাবা প্রথম আমার খেলা দেখছেন। তাকে দেখাবার জন্যই আমি প্রাণপণ ভালো খেলার চেষ্টা করেছি।' 'তোমার বাবা!' চারদিকে তাকিয়ে দেখেন স্যার, 'কই তাঁকে দেখছি না তো! কোথায় তিনি!'

''স্যার আপনি জানেন না। আমার বাবা প্রতিদিন আসতেন, কিন্তু কিছুই দেখতেন না। আমার বাবা অন্ধ ছিলেন।'' স্যার বললেন, 'তবে আজ কিভাবে.....?' ''আজ আমার বাবা আমার খেলা দেখছেন স্বর্গ থেকে। গত চারদিন আগে বাবার মৃত্যু হয়েছে।'' তার কথায় স্যারের দুচোখ জলে ভরে ওঠে, আর স্যারের বুকের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবু।

সহযোগিতা

গ্রামের একজন কৃষক তার উন্নত মানের ফসলের জন্য প্রতি বছরই সরকারের কৃষি দপ্তরের দেওয়া পুরস্কার জিতে নিতেন। তার তৈরী উন্নত মানের বীজের চাহিদাও ছিল প্রচুর। কৃষি দপ্তরের দেওয়া পুরস্কারটি যেন তারজন্যই নির্ধারিত ছিল। তার উন্নতমানের বীজ তৈরীর রহস্য আসলে কি, তা জানার জন্য খবরের কাগজের একজন সাংবাদিক একবার তার গ্রামে হাজির হলেন। গ্রামের বিভিন্ন মানুষ ও সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষকের প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে সাংবাদিক ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে গেলেন। প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারলেন, পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐ কৃষক তার তৈরী ফসলের বীজ তার প্রতিবেশীদের প্রায় বিনামূল্যেই বিতরণ করেন। সাংবাদিক সেই কৃষককে প্রশ্ন করলেন—'আপনি আপনার তৈরী ফসলের বীজ আপনার প্রতিবেশীদের চাষ করার জন্য দেন, তার কারণ কি?'

কৃষক ভদ্রলোক উল্টে জানতে চাইলেন, 'আমার প্রতিবেশীদের আমার তৈরী বীজের ভাগ দিলে অসুবিধা কি?' 'আরে আপনার প্রতিবেশীরা যদি আপনার বীজ থেকে ফসল তৈরী করে প্রতিযোগিতায় নামে তবে আপনি কি আর পুরস্কার পাবেন?' সাংবাদিক উত্তর দিলেন।

'আসলে কি জানেন' কৃষক ভদ্রলোক বললেন—"আমি আমার জমিতে উন্নত মানের ফসল চাষ করি কিন্তু আমার চারপাশে প্রতিবেশীদের জমিতে যদি নিম্নমানের ফসলের চাষ হয় তবে বাতাসের কারণে ও পরাগমিলনের প্রকৃতিগত কারণে সেই নিম্নমানের ফসল আমার উন্নতমানের ফসলের ক্ষতি করবে। সেইজন্য, আমার ফসলের উন্নতমান বজায় রাখার কারণেই আমি আমার প্রতিবেশীদের সাথে আমার বীজ ভাগ করি। তা না করলে আমার ফসলের গুণগতমান ও ফলন দুটোই কমে যেতে বাধ্য।'

এই একই কারণ বিশেষভাবে সমাজ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাজের সব অংশের বিকাশ সমানভাবে না হলে সেই অবিকশিত অংশটি সমাজের উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। যারা সফল তারা অন্যদের বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা করলেই সমাজের সার্বিক বিকাশ সম্ভব। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

একইভাবে সমাজের শিক্ষিত, উন্নত শ্রেণী সমাজের অনুন্নত, অশিক্ষিত,

দুর্বল শ্রেণীর দিকে সহায়তা, সহযোগিতার হাত বাড়ালেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।"

স্বাভিমান

রাতে ভালো ঘুম হয়নি সরলবাবুর। সারা(ণ গতকালের ঘটনাটা চিন্তা করেছেন তিনি, আর উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসেছেন। তার একমাত্র ভাই কয়েকদিন হল বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরেছে। ভাইকে বড় কষ্ট করে বড় করেছেন সরলবাবু। লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন। সেই ভাই এখন বিদেশী কোম্পানীতে উচ্চপদে কর্মরত। এবার বাড়ি ফিরেই সে দাদাকে চমক দিয়েছে। গত কালই সরলবাবুর বাড়িতে বিশাল একটি গাড়ি এসেছে, যা তার একমাত্র ভাই দাদার জন্মদিনে দাদাকে উপহার দিয়েছে। কাল থেকেই সরলবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা।

ভোরে উঠে সরলবাবু পরম যত্নে গাড়িটার গায়ে হাত বোলাচ্ছিলেন। কাপড় দিয়ে গাড়ির গায়ে লেগে থাকা ধুলো পরিষ্কার করছিলেন। অফিস বা বাজার যাত্রী কয়েকজন প্রতিবেশী সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে সরলবাবু আর তার গাড়িকে দেখতে দেখতে তাদের গন্তব্যে চলে যায়। বন্ধু শিশিরবাবু বাজার যাবার পথে সরলবাবুকে এই অবস্থায় দেখে এগিয়ে এলেন। তারপর দুই বন্ধুর বার্তালাপ শু(হল।

শিশিরবাবু— কি হে সরল, গাড়িটা কি নতুন কিনলে নাকি!

সরলবাবু— আরে গতকালই তো কেনা হয়েছে।

শিশিরবাবু— বাঃ বাঃ। খুব দামি গাড়ি মনে হচ্ছে। তা হঠাৎ করে লটারি পেয়েছো নাকি হে, এত টাকা দিয়ে যে গাড়ি কিনলে।

সরলবাবু— আরে না, না। তুমি তো জানো আমার ভাই বড় চাকরি করে। সেই গতকাল আমার জন্মদিনে আমাকে গাড়িটা উপহার দিয়েছে।

শিশিরবাবু— বাঃ, খুব ভাল। সারা জীবন কষ্ট করে অফিস করলে, এবার একটু আরামে যাতায়াত করতে পারবে।

সরলবাবু— তা যা বলেছ।

শিশিরবাবু— ওহো আমারও যদি এমন একটা গাড়ি থাকত হে।

সরলবাবু— না হে শিশির, তোমার বলা উচিত ছিল, আমারও যদি অমন একটা ভাই থাকত।

দু'বন্ধুর কথাবার্তার মধ্যে কখন যেন সরলবাবুর স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। দুজনেই কেউই তা ল(্য করেননি।

হঠাৎ তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী বললেন— অমন কেন বলছ। আমার যদি এমন একটা ভাই থাকত, না বলে তোমার বলা উচিত ছিল, আহা আমিই যদি এমন ভাই হতাম। একথা বলে তিনি হাসতে হাসতে ভিতরে চলে গেলেন। দু'বন্ধু নিশ্চুপ হয়ে ভাবতে লাগলেন।— কি বলে গেলেন কমলা দেবী। কি অসাধারণ চিন্তা, কি ভয়ঙ্কর স্বাভিমান।

জীবনে কেবলমাত্র কিছু নেওয়াই নয়, কিছু দেওয়ার মতো মনোবৃত্তি থাকা দরকার। থাকা প্রয়োজন সেই স্বাভিমানের, যাতে কেবলমাত্র দাতার ভূমিকায় থাকা যায়। জীবনে কি পেলাম তার হিসাব না করে কতটুকু দিলাম তা চিন্তা করার মতো মানসিক প্রবৃত্তি যাতে নির্মাণ হয় তার অনুশীলন করা উচিত।

রাগ

একদিন স্কুলের একটি ক্লাসে শি(ক তাঁর ছাত্রদের বললেন— তোমাদের সকলের মনেই কি কারোর না কারো সম্পর্কে রাগ, দ্বেষ ও অভিযোগ আছে?

উত্তরে সব ছাত্রই একযোগে 'হ্যাঁ' বলে উঠল।

শি(ক বললেন, ''এসো, একটা কাজ করা যাক। আজ বাড়ি গিয়ে যার যার উপর তোমাদের রাগ আছে তাদের প্রত্যেকের নামে একটা করে আলু তোমরা একটা ব্যাগে জমা করবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, ওই ব্যাগটা নিজের কাছে সবসময় রাখতে হবে। যদি তোমরা শর্ত পূরণ করতে পার তবে আমি ৭দিন পরে তোমাদের বলে দেব কিভাবে তোমরা রাগ কম করতে পারবে।''

ছাত্ররা সবাই রাজি হয়ে গেল। পরের দিন সবাই স্কুলে এল আলাদা একটা করে ব্যাগ নিয়ে। কারো কারো ব্যাগ আবার বেশ বড় হয়েছে। কারণ তাদের রাগ করার লোকের সংখ্যা অনেক। দু-এক দিন যাবার পরই ছাত্ররা শি(ককে অভিযোগ জানাতে শু(করল, 'স্যার এই ব্যাগ আর রাখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।'

শি(ক বললেন, — ''আরও কয়েকটা দিন কাছে রাখো।''

ছাত্ররা ব্যাগটা কাছে রাখতে রাজি নয়। কারণ এরপর দুর্গন্ধের জেরে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। পচা আলুর গন্ধে থাকা যাচ্ছে না। শি(ক বললেন, দেখো, তোমরা মনের মধ্যে যাদের যাদের নামে রাগ, ে াভ ও দ্বেষ জমা করে রেখেছো, একদিন সেগুলি পচে গিয়ে ঠিক এভাবেই গন্ধ ছড়াবে, আর তা তোমাকে অসুস্থ করে দেবে। সেজন্য পচা আলুগুলি ফেলে দিয়ে যেমন তোমরা মুক্তি(পেতে চাও, তেমনি রাগ দ্বেষ পুষে না রেখে সেগুলি পচার আগেই ফেলে দেওয়া সকলের মানসিক স্বাস্থ্যের প(ই মঙ্গলজনক।

অভ্যাস

বিদ্যালয়ের বনভোজন। ছাত্র, শি(ক সবাই খুশি। বছরে একবার সবাই মিলে শহরের বাইরে কোথাও জঙ্গলে নদীর ধারে গিয়ে সারাদিন মজা, আনন্দ করা। মায়ের শাসন, বাবার বকুনি— সব যেন উধাও হয়ে যায়। এবারেও তার ব্যতিত্র(ম হয়নি। নতুন বিজ্ঞানের শি(ক ত(ণবাবুর নেতৃত্বে সবাই এসেছে এক নতুন জায়গায় বনভোজন করতে। এখানে নদী আছে, জঙ্গল আছে, এমনকি ফাউ হিসাবে একটা ছোটখাটো পাহাড়ও রয়েছে।

সকালের জলখাবারের পর সবাই ত(ণবাবুকে ঘিরে ধরল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে নিয়ে যেতে হবে। স্যার খোঁজ খবর করে দেখলেন, ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই সকলকে নিয়ে পাহাড় থেকে ঘুরে আসা সম্ভব।

ছাত্রদের আনন্দ দেখে কে, সবাই কোলাহল করে দল বেঁধে চলতে শু(করল পাহাড়ের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে সকলকে গোল করে একত্র করলেন ত(ণবাবু। সকলকে একটা করে চকোলেট দিলেন। তারপর দলের মধ্যে সবথেকে দুর্বল শুভকে একটা ছোট্ট চারা গাছ দেখিয়ে সেটা তুলতে বললেন। শুভ অনায়াসেই সেই চারাগাছটা তুলে ফেলল। এবার স্যার দলের মধ্যে সবথেকে শক্তি(শালী আর স্বাস্থ্যবান বাপ্পাকে একটা ছোট ঝোপ দেখিয়ে সেটা তুলতে বললেন। বাপ্পা হেলতে দুলতে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গিয়ে একহাত দিয়ে ঝোপটাকে ধরে টান দিল, কিন্তু কিছু করতে পারল না। তখন সে দু'হাত দিয়ে ধরে সজোরে টানতে লাগল। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও ঝোপটাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে পারল না। স্যার আরও কয়েকজনকে বাপ্পার সঙ্গে হাত লাগাতে বললেন। বাকি ছেলেরা বাপ্পার সঙ্গে যোগ দিল, আর অনেক(ণ

চেষ্টার পর সেই ঝোপটাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলল। এবার স্যার সব ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে একটা বড় গাছ দেখিয়ে বললেন, তোমরা সবাই মিলে এই গাছটাকে কি মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে পারবে?

ছাত্ররা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল— পারব না, পারব না।

তখন স্যার বললেন, তাহলে ছাত্ররা, আজ এই ছোট্ট ঘটনা থেকে আমরা কি শি(া পেলাম? ক্লাসের ফার্স্ট বয় সন্দীপ বলে উঠল, স্যার এর থেকে শি(া পেলাম, ছোট গাছকে সহজে উপড়ে ফেলা যায়, একটু বড় হলে অনেক চেষ্টার পর অনেক শক্তি(প্রয়োগ করে তাকে উপড়াতে হয়, আর যখন পূর্ণবয়স্ক গাছ হয় তখন তাকে মাটি থেকে তুলে ফেলা অসম্ভব।

ঠিক— স্যার বললেন। আমাদের জীবনের (ত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। দেখো, আমাদের বদ অভ্যাস হল এই গাছগুলির মতো। যখন তা ছোট থাকে তখন তার থেকে মুক্তি(পাওয়া সহজ। কিন্তু বেশি দেরী হয়ে গেলে সেই বদঅভ্যাসগুলি থেকে মুক্তি(পাওয়া অসম্ভব। সেইজন্য বদ অভ্যাস বদগুণ যখন ছোট থাকে তখনই তাকে নাশ করা কর্তব্য। তা যদি বড় বৃ(র আকার ধারণ করে, তখন তার থেকে মুক্ত(হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

সংঘর্ষ

ছাত্ররা আজ সবাই সকাল সকাল স্কুলে এসে গেছে। অনেকদিনের অপে(ার আজই অবসান হবে। জীবন বিজ্ঞানের হাতে কলমে একটি শি(া আজ পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। জীবন বিজ্ঞানের শি(ক শম্ভুবাবু গত কয়েকদিন ধরে পড়াচ্ছিলেন কিভাবে শুঁয়োপোকা গুটি তৈরি করে, তারপর সেই গুটি ভেঙ্গে শুঁয়োপোকা কিভাবে প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে।

শুধু পড়ানোই নয়, সেই বিচ্ছিরি শুঁয়োপোকাটা কিভাবে রঙ্গিন প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে উড়ে যায় তার পরী(া করেও স্যার দেখাচ্ছেন। একটা আস্ত শুঁয়োপোকা কিভাবে গুটিতে রূপান্তরিত হল তা ছাত্ররা সবাই প্রত্য(করেছে, আর স্যার বলেছেন আজই সেই গুটি ভেঙ্গে প্রজাপতি ডানা মেলবে। সেটা দেখার জন্যই সবাই আজ তাড়াতাড়ি স্কুলে এসেছে।

গুটিটা সযত্নে একটা বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে, আর বাক্সটা রয়েছে বড়

টেবিলটার ওপর। ছাত্ররা সবাই টেবিল ঘিরে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শম্ভুবাবু বলেছেন, আর কিছু(ণের মধ্যেই গুটি ভেঙ্গে প্রজাপতি বেরিয়ে আসবে। এ যেন আশ্চর্য এক জাদু। সবাই দেখল যে, শুঁয়োপোকা গুটি তৈরি করেছে আর আজ সেই শুঁয়োপোকা হয়ে যাবে প্রজাপতি।

হেডমাস্টার মশাইয়ের ডাকে তাঁর ঘরে গেছেন শম্ভুবাবু। সবাইকে বারবার বলে গেছেন, কোনও কারণেই যেন গুটিতে কেউ হাত না লাগায়। সবাই টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে কোলাহল করলেও কেউ গুটিতে হাত লাগায়নি। এমন সময় সবাই দেখল, হঠাৎ গুটিটা ফেটে গেছে, আর ছোট্ট একটা প্রজাপতি প্রাণপণে সেই গুটিটা থেকে বাইরে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফাটা মুখটা ছোট বলে বাইরে আসতে পারছে না। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল আকাশ, ছোট্ট প্রজাপতিটার কষ্ট দেখে সে আর থাকতে পারল না, হাত দিয়ে গুটিটার ভাঙ্গা অংশটা একটু বড় করে প্রজাপতিটাকে বাইরে আসতে সাহায্য করল। আকাশের সাহায্য পেয়ে প্রজাপতি বাইরে আসতেই ছেলেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট্ট প্রজাপতিটা ওড়ার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও। হাততালির আওয়াজ শুনে শম্ভুবাবু তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। টেবিলের দিকে তাকিয়ে মরা প্রজাপতিটা দেখে তিনি অবাক হয়ে প্র(করলেন— এটা কি করে হল?

ছাত্রদের কাছে সব শুনে তিনি ছাত্রদের বলেন, 'দেখ, প্রজাপতিটা যখন গুটি ভেঙ্গে বাইরে আসতে চাইছিল তখন তোমরা তাকে গুটি ভেঙ্গে বাইরে আসতে সাহায্য করেছ। যে কাজটা প্রজাপতিটার করার কথা, তোমরা সেটা করে দিয়ে প্রজাপতির অকাল মৃত্যুর কারণ হলে। কারণ, গুটি থেকে বাইরে আসার জন্য প্রজাপতিকে যে সংঘর্ষ করতে হত, তাতে তার ডানা শক্ত(হত, বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযুক্ত(হত। কিন্তু তা না করার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। মানুষের জীবনও তেমনি। বিনা সংঘর্ষে জীবনে বড় কোনও সফলতা সম্ভব নয়। অনেক সময় আমরা অজান্তেই আমাদের প্রিয়জনের (তি করি। কারণ সংঘর্ষের ফলে জীবনযুদ্ধে লড়াই করার যে শক্তি(পাওয়া যায়, আমরা সংঘর্ষ করতে না দিয়ে তার সেই শক্তি(নষ্ট করি। যারা জীবনে সংঘর্ষ করে তারা, তাদের থেকে অনেক বেশি আত্মবি(াসী যারা কোনও সংঘর্ষ করেনি। আমাদের সকলের নিজের নিজের সমস্যা আছে। বড় সমস্যার সামনে বেশিরভাগ লোকই নিরাশ হয়ে যায়। কিন্তু বাধাকে জয় করার একমাত্র উপায় হল হার না মানা।

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে— শান্ত সমুদ্রে কখনও কুশল নাবিক তৈরি হয় না (A smooth sea never made a skillful mariner)।

আমরা যদি বাধার বি(দ্ধে সমস্যার বি(দ্ধে সংঘর্ষ করি, তবে তা আমাদের মজবুত হবার শক্তি(দেবে। আমাদের প(জীবনের সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আমাদের কাছেই রয়েছে।

আদর্শ পরিস্থিতি কখনও আসেনি, আসবেও না। ল(্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোনও প্রবাহে আমরা গা ভাসাতে পারি না, আবার কিনারায় অপে(া করেও ল(্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কখনও হাওয়ার প(, কখনও হাওয়ার বিপ(লড়াই করেই আমাদের নৌকা বাইতে হবে। কিন্তু বাধার সামনে থামলে চলবে না। চলতেই হবে, চলতেই হবে, চরৈবেতি চরৈবেতি।

প্রতিধ্বনি

আনন্দ মহারাজ সন্ধ্যায় মিশনে ফিরে দেখেন আশ্রমের গেটের বাইরে এক পাশে ছোট্ট বুবাই দাঁড়িয়ে। বুবাইয়ের চোখমুখ দেখেই বুঝলেন, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। কাঁধ থেকে থলেটা নামিয়ে বুবাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মহারাজ বুবাইয়ের কাছে জানতে চান, — 'কী হয়েছে? তুমি এই সময় এখানে কেন? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

বুবাই মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মাথাটা একবার নাড়াল। বাড়িতে মা'র কাছে থাপ্পড় খাওয়ার দৃশ্যটা তখনও বুবাইয়ের চোখের সামনে ভাসছে। চোখের জলটা কোনওরকমে মুছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উত্তর দিল— ''মহারাজ, মা আমাকে মেরেছে। আমি তোমার এখানেই থাকবো। আমার মা একদম ভালো নয়।'' মহারাজ বুঝলেন, বুবাই বাড়িতে নিশ্চয় কোনও গোলমাল করেছে। বুবাই নিজের দোষটা আড়াল করে শুধু ''আমার মা ভালো নয়,''— বলে কাঁদতে শু(করল।

মহারাজ কোনও মতে বুবাইকে চুপ করিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আরতির পর ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে বুবাই তখন অনেকটাই স্বাভাবিক। মহারাজ তাকে নিয়ে মন্দিরের বিরাট হলঘরের বারান্দায় এসে বসলেন। মহারাজ ভাবলেন, বুবাই হয়ত এখন সব ভুলে গেছে, মা'র ওপর রাগ কমে গেছে। এই

ভেবে মহারাজ বুবাইকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বুবাই অনড়। মহারাজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে মুখে যেটুকু হাসির ভাব ছিল তাও নিমেষে উধাও হল। বুবাই আবার বলতে লাগল, — ''আমি বাড়ি যাব না, বাড়িতে মা আছে। মা আমাকে মেরেছে।''

মা'র নিন্দা মহারাজের ভালো না লাগলেও মহারাজ জানেন, ধমক-ধামক দিয়ে বুবাইকে থামিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বিষয়টা তাকে বোঝাতে হবে। তিনি বুবাইকে কোনওমতে চুপ করিয়ে বললেন— ''বুবাই, তুমি ঠাকুরের কাছে গিয়ে বল, তোমার মা ভালো নয়'। বুবাই অবাক চোখে মহারাজের দিকে তাকিয়ে প্র(করে, ''ঠাকুরের কাছে বললে কি হবে?''

মহারাজ— ''গিয়ে দেখই না। ঠাকুর তোমাকে কী বলেন?''

বিরাট মন্দিরের একপ্রান্তে ঠাকুরের আসন, ধীর পায়ে বুবাই ঠাকুরের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে— ''আমার মা ভালো নয়।'' কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! মন্দিরের চার দেওয়াল বেয়ে কে যেন তার কানের কাছে চিৎকার করে বলে ওঠে 'আমার মা ভালো নয়', 'আমার মা ভালো নয়'। বুবাই ভয়ে মন্দির থেকে দৌড়ে এসে মহারাজকে বলে— ''ঠাকুরও বলছে মা ভালো নয়।'' মহারাজ সবকিছু বুঝলেও বুবাইকে কিছুই বললেন না। তিনি বুবাইকে কাছে টেনে বললেন, বুবাই এবার ঠাকুরের কাছে গিয়ে বল, 'তোমার মা ভালো'।

বুবাই মহারাজের কথা শুনে অবাক হয়ে উত্তর দিল— ''মহারাজ আমার মা তো ভালো নয়। তাহলে তুমি আমাকে ভালো বলতে বলছ কেন?''

মহারাজ বলেন, ''চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এবার তুমি বলবে— আমার মা ভালো। দেখ এবার ঠাকুর কী বলেন!'' মহারাজ বুবাইয়ের হাত ধরে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করলেন। বুবাই চোখ বন্ধ করে মহারাজের কথা মতো চিৎকার করে বলে ওঠে— 'আমার মা ভালো।'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্রই বুবাই চমকে উঠল। কে যেন তার কানের কাছে বলে চলেছে,— আমার মা ভালো, আমার মা ভালো।

বুবাই বলে ওঠে মহারাজ, 'ঠাকুর বলছে আমার মা ভালো'।

হাসতে হাসতে মহারাজ বুবাইকে বলেন, ''দেখলে তো, ঠাকুর কেমন তোমার মাকে ভালো বললেন।''

কিন্তু মহারাজ একটু আগেই তো ঠাকুর বলল....

বুবাইকে থামিয়ে দিয়ে মহারাজ বলেন, **'আসলে কি জানো? আমাদের জীবন**

যেন এক প্রতিধ্বনি। আমরা তাই ফেরত পাই, যা আমরা অন্যকে দিয়ে থাকি। কেবল যা দিই তাই নয়, তার অনেক বেশীই ফেরৎ পাই। প্রকৃতপ(যখন আমরা অন্যের জন্য ভালো কাজ করি তখন নিজের অজান্তেই নিজেরই আরও ভালো করি, নিজেকেই ভালো করি.... বড় হলে এসব কথা আরও ভালো করে বুঝতে পারবে। এখন চল, তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি, মা চিন্তা করছেন।''

খোঁজ

ছোট্ট খুকু সেই কখন থেকে কেঁদে চলেছে বাড়ির উঠানে বসে। সবাই তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে, চুপ করাবার চেষ্টা করছে। বাবা, কাকা, দাদা, ঠাকুমা, দাদু, দিদি, পিসি সবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। চকলেটের লোভ, আইসক্রীমের লোভও দেখানো হয়েছে। কিন্তু তার কান্না আর থামছে না। কান্নার কারণ কিন্তু ভয়ঙ্কর, কেউই তার সমাধান করে উঠতে পারছে না! ছোট্ট খুকু উঠানে তার যে ছায়া পড়ছে সেটাকে ধরতে চায়। বারবার চেষ্টা করেও সে তার ছায়াটাকে ধরতে পারেনি। সে যতই ছায়াটার দিকে এগোয় ছায়াটাও ততই এগিয়ে যায়। শেষে ছায়া ধরার চেষ্টা ছেড়ে সে কাঁদতে শু(করেছে। বাবা, কাকা সবাই তাকে বুঝিয়েছে ছায়াকে ধরা যায় না। কেউ ছায়াকে ধরতে পারবে না। কারণ ছায়াকে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই সব জ্ঞানের কথা ছোট্ট খুকুর মাথায় ঢোকেনি আর তার কান্নাও থামেনি।

খুকুর মা গিয়েছিল পুকুরে স্নান করতে। কান্না শুনে তিনি এসে ঘটনা শুনে মেয়েকে কোলে নিতে যান। কিন্তু মেয়ে তার ছায়াকে না ধরে কিছুতেই মায়ের কোলে উঠবে না। শেষে মা মেয়েকে বলেন, আচ্ছা তুমি তোমার ছায়াকে ধরবে তো, তবে দেখ কিভাবে ধরতে হবে। তুমি এখন তোমার নিজের মাথার চুলগুলো মুঠি করে ধর। মায়ের কথায় মেয়ে তার নিজের চুলগুলি মুঠি করে ধরতেই ছায়াকেও ওই অবস্থায় দেখে সে হেসে বলে উঠল,— আমি ছায়া ধরেছি, আমি ছায়া ধরেছি। তার কান্না থেমে গেল। আবার খুশির পরিবেশ ফিরে আসে বাড়িতে। **প্রকৃতপ(সত্যিকারের আনন্দ আর শান্তির জন্য বাইরে খোঁজ করার প্রয়োজন নেই, বাইরে তা কখনও পাওয়া যাবে না। তার জন্য নিজের ভিতরে খোঁজ করতে হবে। ছায়া ধরার মতো নিজের মধ্যেই শান্তিকে পেতে হবে, আনন্দের খোঁজ করতে হবে।**

চোখের বাহিরে

ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে মেল ট্রেন। যাত্রীঠাসা কামরায় জানালার ধারে মায়ের কাছে বসে রয়েছে বছর ত্রিশের এক যুবক। কামরার সব যাত্রীদের কৌতূহল সেই যুবককে ঘিরে। হঠাৎ সেই জানালার ধারে বসা যুবক মাঠে গ(দেখিয়ে তার মাকে প্র(করছে— 'মা ওটা কি'? তার মা খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিচ্ছেন— 'বাবা, ওটা গ(।' কিন্তু কামরার বাকি লোকেরা যুবকের এই ধরনের প্র(শুনে মজা পাচ্ছে। ট্রেনের জানালা থেকে রাস্তায় দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া বাস বা গাড়ি দেখিয়ে যুবকটির কৌতূহলী প্র(যাত্রীদের আরও মজা দিচ্ছিল। কিন্তু এইভাবে বেশি(ণ চলতে পারে না। একসময় ৩০ বছর বয়সী যুবকটির এই শিশুসুলভ প্র(গুলি সাধারণ যাত্রীদের বিরক্ত(করে তুললেও যুবকটির মা কিন্তু একটুও বিরক্ত(না হয়ে সব প্র(ের উত্তর দিচ্ছিলেন, এতে অন্য সহযাত্রীরা আরও অবাক হচ্ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই সব যাত্রীর মনে প্র(জাগছিল, যুবকটির মানসিক চিকিৎসা কেন করাচ্ছেন না ভদ্রমহিলা! কিন্তু একথা মুখফুটে কেউই ভদ্রমহিলাকে বলতে পারছিল না। এমন সময় আকাশ কালো করে মেঘ উঠল, সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। মেঘ আর ঝড়ের হাওয়াতে যুবকটির উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে গেল। চিৎকার করে সে সুরেলা গলায় গান গেয়ে ওঠে— 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, পাগল আমার মন মেতে উঠে'। সে আনন্দে চিৎকার করে মাকে বলতে থাকে, 'মা, মা, বৃষ্টি, বৃষ্টি'। জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে সে খুশিতে ভিজতে থাকে। বাইরের প্রবল বৃষ্টির জল জানালা দিয়ে ভিতরে এসে অন্য যাত্রীদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। যুবকটির উল্টো দিকে এক নববিবাহিত দম্পতি বসেছিল। বৃষ্টির জলে তাদের বিয়ের নতুন পোশাক ভিজে যাওয়াতে ত(ণীটি রেগে উঠল। উঠে গিয়ে জোর করে যুবকটিকে সরিয়ে দিয়ে সে জানালা বন্ধ করে দেয়। তারপর যুবকটির মা'কে বলে, 'মাসিমা, আপনি একা এই অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন! আপনি এখনই আপনার ছেলেকে কোনও মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে সুস্থ করে তুলুন'।

ত(ণীটির কথায় যুবকটির মা ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলেন— 'মা, আমার ছেলেকে আমি হাসপাতাল থেকেই বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।' অবাক যুবতীটি প্র(করে, 'হাসপাতাল ছেড়ে দিল! কিন্তু উনি তো এখনও সুস্থ হননি!'

উত্তর দেন মহিলা— না, আমার ছেলে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ!

—কিন্তু মাসিমা?

যুবতীর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে মহিলা ধীরে ধীরে বলেন— 'আসলে কি জানো, ও আমার একমাত্র সন্তান। ও জন্ম থেকেই অন্ধ ছিল। আজ ২৮ বছর পরে ডাক্তারবাবুদের অক্লান্ত চেষ্টায় মাত্র গত সপ্তাহেই ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। এতদিন আমার ছেলে দেখত আমাদের চোখে, আজ দেখছে নিজের চোখে। এই পৃথিবীর রূপ-রং, প্রকৃতি, জীব-জন্তু সব ওর কাছে নতুন। তাই সব কিছু ভুলে উৎসাহে ছটফট্ করছে। গতকাল সকালেই ও আমাকেও প্রথমবার দেখেছে। আজ হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

নিঃশব্দ কামরায় শুধু ট্রেনের ছুটে চলার আওয়াজ শোনা যায়।

অনেক সময় আমরা যা কিছু চোখের সামনে দেখি, তা সত্য ঘটনা হতে পারে, কিন্তু সেই ঘটনার পিছনের কারণ না জেনে তার সম্পর্কে মন্তব্য করা বা একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা পরবর্তীকালে আমাদের মনস্তাপের কারণ হয়।

প্রথমে কি

প্রিয় অধ্যাপক দুর্গাদাসবাবুকে হাতে বিরাট একটা কাচের জার আর কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে ক্লাসে ঢুকতে দেখে পদার্থ-বিদ্যার ক্লাসের ছেলেরা হেসে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ কৌতূহলীও। কারণ দুর্গাদাসবাবু যেমন সুন্দর পড়ান তেমনি প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসেও সব ছাত্রকে সুন্দর করে সব কিছু বুঝিয়ে দেন। কিন্তু আজ তো প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস নয়, আর প্র্যাক্টিক্যাল করার জন্য আলাদা কক্ষ রয়েছে। তবে স্যার কেন এত বড় একটা জার আর থলে নিয়ে ক্লাসে এসেছেন, তাই তাঁর ছাত্ররা বুঝে উঠতে পারছিল না। স্যারের নিশ্চয় কোনও উদ্দেশ্য আছে ভেবে কেউ কোনও প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়ল। টেবিলের ওপর কাঁচের বড় জারটা রেখে থলেটা হাত থেকে নামিয়ে স্যার চেয়ারে বসলেন। তারপর তাঁর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, — ''কিরে, খুব অবাক হয়েছিস, তাই না? ভাবছিস স্যার আজকে আবার কোন প্রয়োগ হাতে-কলমে শেখাবেন। আসলে কি জানিস, আজকে আমি পদার্থ-বিদ্যার কোনও প্রয়োগ তোদের দেখাবো না। আজ জীবনের একটা সত্য প্রয়োগ তোদের সামনে মেলে ধরব।''

দুর্গাদাসবাবুর কথায় ছাত্রদের কৌতূহল আরও তীব্র হল। তারা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল, স্যার কি করেন তা দেখার জন্য। দুর্গাদাসবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন একটা কাগজের বাক্স, যা ছাত্রদের অতি পরিচিত। ছাত্ররা জানে ওই বাক্সটার মধ্যে থাকে টেনিস বল। কিন্তু স্যার কাচের জার আর টেনিস বল নিয়ে যে কি করবেন সেটাই কেউ বুঝতে পারছিল না। বাক্সটা খুলে দুর্গাদাসবাবু একটা একটা করে মোট ১০টা বল কাচের জারটার মধ্যে ফেলে দিলেন। জারে ১১ নম্বর বলটা আর ঢোকাতে পারলেন না। এবার তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন— ''জারটা কি ভর্তি হয়েছে?'' ছাত্ররা সমস্বরে হ্যাঁ বলে উঠল। কিছু না বলে দুর্গাদাসবাবু আবার ঝোলার মধ্যে থেকে বার করে আনলেন একটা শক্ত কাগজের বড় ঠোঙা। ছাত্রদের কৌতূহলী জিজ্ঞাসার সামনে ঠোঙা থেকে মুঠো ভর্তি করে ছোট ছোট পাথরের টুকরো নিয়ে জারের মধ্যে ফেলতে থাকলেন আর বলগুলির মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে পাথরগুলি জারটিকে ভর্তি করতে লাগল। জারটা সম্পূর্ণ ভরে গেলে তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, — ''জারটা কি পূর্ণ হয়েছে?'' উত্তরে ছাত্ররা আবার হ্যাঁ বলে উঠতেই দুর্গাদাসবাবু ব্যাগ থেকে একটা কৌটো বার করে তার থেকে বালি নিয়ে সেই জারটির মধ্যে ঢালতে লাগলেন। অন্য হাত দিয়ে জারটিকে অল্প অল্প নাড়াতে লাগলেন। ফলে পাথরের ফাঁক দিয়ে বালি গিয়ে জারটিকে ভরে ফেলতে লাগল। বালি ঢালা সম্পূর্ণ হলে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন— ''জারটা কি ভর্তি হয়েছে?''

এবার কিন্তু ছাত্ররা তার কথায় জোরে হেসে উঠল। কারণ আগের দু'বার তারা হ্যাঁ বলে ঠকে গিয়েছে। এবার দুর্গাদাসবাবু শুরু করলেন— ''ছেলেরা, এই যে কাচের জার, মনে কর এটা হল আমাদের জীবন। আর বলগুলি হল ঈশ্বর, দেশ, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি। ছোট ছোট পাথরগুলি হল পরিবার, পরিজন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, আর বালি হল চাকরি, ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি নিজের সুখ, আনন্দ। এককথায় নিজের স্বার্থ। এখন জারের মধ্যে আমি প্রথমে বল অর্থাৎ ঈশ্বর, দেশ, সমাজ, ধর্ম রাখলাম। তারপর কিন্তু খুব সহজেই তার মধ্যে পাথর অর্থাৎ পরিবার, আত্মীয় প্রবেশ করল। তারপরেও বালিরূপী নিজের স্বার্থ স্থান করে নিল। এখন আমি যদি প্রথমেই বালি রাখতাম, অর্থাৎ নিজের স্বার্থ রাখতাম, তাহলে কিন্তু পাথর অর্থাৎ পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু কারোর কোনও স্থান হত না। দেশ, সমাজ, ঈশ্বর, ধর্ম তো নয়ই। অবশ্য যদি পাথর অর্থাৎ পরিবার, আত্মীয়

চাকরি, ব্যবসা প্রথমে রাখতাম তাহলে তার মাঝে মাঝে বালিরূপী নিজ স্বার্থ স্থান করে নিত, কিন্তু বলরূপী ঈ(র, দেশ, ধর্ম, সমাজের স্থান কখনোই হত না।''

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একথা সত্য। আমাদের প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে, কোনটা আমাদের কাছে জ(রী। বল নাকি বালি। যদি প্রথমেই বালি বা পাথর দিয়ে জার ভরে ফেলি তবে কিন্তু বলের কোনও স্থান সেখানে হবে না। যদি এব্যাপারে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি, তবে জীবনে নিশ্চয় আমরা পরিপূর্ণ, সন্তুষ্ট থাকতে পারব।

আর একটা সুযোগ

সকালে ঘুম ভেঙ্গে চোখ খুলেই চমকে উঠল শ্রীকান্ত। ঘড়ির কাঁটা ৯টা পেরিয়ে গেছে। উঃ! আজ আবার অফিসে দেরী হবে আর অনেক গু(ত্বপূর্ণ মিটিং বাতিল করতে হবে। সব রাগটা গিয়ে পড়ল তার স্ত্রীর ওপর। একেবারে অকর্মণ্যা মহিলা, কোনও কিছুই গুছিয়ে করে উঠতে পারে না। রান্নার কাজে এত ব্যস্ত যে, যার জন্য রান্না করছে সে যে এখনও ঘুমিয়ে আছে, সেটাও মনে নেই। আর দেরি না করে সোজা বাথ(মের মধ্যে ঢুকে যায় শ্রীকান্ত। ব্রাশ করে, স্নান সেরে অফিস যাবার জন্য তৈরি হয়ে বাথ(ম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। খাবার টেবিলে বসতে গিয়ে চমকে ওঠে। হল ভর্তি লোকজন, চেনা-অচেনা মানুষে ভর্তি তার সাধের ড্রইং (ম। একটু এগোতে আরও চমক। ঘরের মাঝখানে সে নিজে শুয়ে আছে আর তার পাশে বসে তার স্ত্রী কেঁদে চলেছে। মাথার কাছে বসে তার মা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে একটানা কেঁদে চলেছে। তার ছেলে মেয়ে তার শরীরের পাশে বসে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। বাবা উদাস দৃষ্টিতে বসে রয়েছে ঘরের কোণে সোফার ওপর। এসব দেখার পর শ্রীকান্তের মনে পড়ে যায় গত রাত্রের কথা। গত রাত্রে খাবার টেবিলে হঠাৎ তার বুকে ব্যথা শু(হয়। ...তারপর..., তারপর আর তো তার মনে নেই। তাহলে কি তার মৃত্যু হয়েছে! কিন্তু তা কি করে হয়! এই তো সে জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে। তাড়াতাড়ি ছোটমেয়েটাকে কোলে তুলে নিতে যায় শ্রীকান্ত। কিন্তু না, মেয়েকে স্পর্শ করতে পারে না সে। তারপর ছেলে-মেয়ে, মা, বাবা সকলকে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

''....হে ভগবান, আমার কী সত্যি সত্যি মৃত্যু হয়েছে!'' চিৎকার করে ওঠে

শ্রীকান্ত। চোখ পড়ে যায় তার বাবার দিকে। তার বাবা সারা জীবন গ্রামে চাষ-আবাদ করেছেন, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শি(া দিয়েছেন। নিজে কষ্ট করেছেন, কিন্তু কখনও ছেলেমেয়েদের কষ্ট করতে দেননি। শ্রীকান্ত উচ্চশি(িত হয়ে বড় চাকরি পাওয়ায় বাবা নিশ্চিন্তে জমিজমা বিক্রি(করে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। আর শ্রীকান্ত বড় চাকরি পেয়ে নিজেকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। শহর জীবনের সুখ ছেড়ে গ্রামের দিকে ফিরেও তাকায়নি। গতবছর বাবা পুরনো বাড়ির ছাদ সারাবার জন্য কিছু টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের নতুন ফ্ল্যাট কেনার অজুহাতে এড়িয়ে গেছে শ্রীকান্ত।

চিৎকার করে ওঠে শ্রীকান্ত— 'হে ভগবান একবার আমাকে বাঁচিয়ে দাও। বাবার প্রতি যে নির্দয় ব্যবহার করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আমি। একবার, শুধু একবার ভগবান।'

হঠাৎ মায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে শ্রীকান্ত। তার মা, সারা জীবন গ্রামের বাইরে কোথাও পা রাখেননি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। নিজে না খেয়ে অন্যদের বঞ্চিত করে তাকেই ভালো খাবারগুলো খাইয়েছেন তার মা। মায়ের অনেকদিনের ইচ্ছা, একটু তীর্থ করতে যাবার— হরিদ্বার, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন। বলেছেনও শ্রীকান্তকে। কিন্তু প্রতিবারই সময়ের অভাব দেখিয়ে বিষয়টা এড়িয়ে গেছে শ্রীকান্ত। আজ তার মনে হয়, তার জন্মদাত্রীকে দীর্ঘদিন ঠকিয়েছে সে। এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে সে ভাবে আর একটা সুযোগ যদি পাই। তার স্ত্রী, যাকে কখনও দুটো মিষ্টি কথা বলেনি শ্রীকান্ত, বাবা-মায়ের পছন্দ করা গ্রামের স্বল্প শি(িতা সুন্দরী মেয়েটিকে কখনও যোগ্য মর্যাদা দেয়নি সে, সব সময় মনে করেছে, এ মেয়ে তার উপযুক্ত(নয়। কিন্তু কখনও কোনও অভিযোগ জানায়নি বেচারি। তার স্বল্প শি(িতা স্ত্রীর প্রতি একটু ভালো ব্যবহার কি সে করতে পারত না! কিন্তু সে সুযোগ আর তো পাওয়া যাবে না! অসহায় দৃষ্টি মেলে শ্রীকান্ত ঘরের দিকে। তার ছোট বোনেরা, যাদের জন্য বিদেশ থেকে কখনও কোনও উপহার আনেনি, তাদের সঙ্গে সম্পর্কও রাখে না সে। তার বন্ধু, অফিসের সহকর্মীরা সবাই ভীড় করে এসেছে তাকে শেষ বিদায় জানাতে। যাদের অনেকের সঙ্গেই তার সদ্‌ভাব ছিল না। তারা আজ কেমন করে তার মা-বাবা, সন্তানদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। এদের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার আর কখনও কোনও সুযোগই পাওয়া যাবে না। যদি একবার সুযোগ পেতাম, তবে আমি নিশ্চয় আমার আমূল পরিবর্তন ঘটাতাম। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে

শ্রীকান্ত-- ''হে ভগবান! আর একটা সুযোগ দাও।''

হঠাৎ অনুভব করে শ্রীকান্ত কে যেন তাকে জোরে জোরে ঠেলছে আর ডাকছে— ''এই শুনছো, কি হয়েছে তোমার। তুমি কি স্বপ্ন দেখছো।''

অবাক বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রীকান্ত। সেকি সত্যি স্বপ্ন দেখছিল! বুঝে উঠতে পারে না সে, কোনটা সত্যি— তার স্বপ্ন দেখা, নাকি বাস্তব অবস্থা।

উঠেপড়ে শ্রীকান্ত। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাইকে অবাক করে বলে ওঠে, সবাই উঠে পড়। চল আজকেই সবাই মিলে গ্রামের বাড়িতে দাদু-ঠাকুমা-পিসিদের কাছে যাব। শ্রীকান্ত ভাবে, ভগবান তার কাতর প্রার্থনা শুনে একটা সুযোগ তাকে দিয়েছেন। সেই সুযোগ সে নষ্ট করতে পারে না। আজ থেকেই শু(করবে তার নতুন জীবন। আর একবার সুযোগ হয়তো সে নাও পেতে পারে।

ইচ্ছা থাকলে

একমাত্র সন্তান রবিকে চিঠি লিখেছিলেন বীণাপানি দেবী। কিন্তু কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নি, তার চিঠি লেখার পরিণাম এই হতে পারে। অনেকদিন ছেলেকে দেখেননি বৃদ্ধ বাবা-মা। অভাবের সংসারে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের একমাত্র ভরসা ছিল রবি। কিন্তু গত কয়েক মাস তার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করার উপায় নেই। এদিকে বর্ষা এসে গেছে। গত বছর কোনও জমিতে চাষ করা যায়নি। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের পক্ষে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া বা পরিশ্রমের কাজ সম্ভব নয়। এসব কাজ তাদের আদরের রবিই করত। পড়াশোনাতেও ভাল ছিল রবি। শহরের কলেজ থেকে পাশ করে এসেও গ্রামেই থাকতে ভালবাসত সে। গ্রামের জমি, জল, জঙ্গল, গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই সুখে দিন কাটত তার। কিন্তু হঠাৎই বদলে গেল সব। তাদের জঙ্গলমহল হঠাৎ হয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র।

গরুর হাম্বা ডাক, ছাগলের ব্যা-ব্যা, পাখির গানে অভ্যস্ত গ্রামের মানুষ এখন বন্দুক, বোমার আওয়াজে চমকে উঠছে। গ্রামে মানুষই বা কোথায়! বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু ছাড়া তরুণ, যুবকরা সব হয় জেলের মধ্যে অথবা নিরুদ্দেশ। গ্রামে থাকলেই পুলিশের চর বলে অতি বিপ্লবীদের শিকার হতে হবে অথবা অতি বিপ্লবী বলে পুলিশের হাতে মার খেয়ে জেলে যেতে হবে। গ্রামের অনেক ছেলের কপালে যা ঘটেছে। গ্রামে কোনও বাইরের মানুষ আসতে পারে না। ফলে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগও সম্ভব হয় না। আবার গ্রামের জমি বাড়ি ছেড়ে

অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার মতো সামর্থ্যও গ্রামের মানুষের নেই। আসলে গ্রামের মানুষের কাছে 'নেই' শব্দটা এত বেশি পরিচিত যে নতুন করে দু-একটা নেই যোগ হলেও তাদের কিছু পরিবর্তন হয় না। রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল নেই, স্কুল নেই, আইন নেই। অথচ সব কিছুই থাকার কথা ছিল। শোনা যায়, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্রামের উন্নতির জন্য সরকার ব্যয় করছে। কিন্তু কোথাও কিছু উন্নতি দেখা যায় না। অবশ্য নেতাদের বাড়ি ও বপুগুলি যে বাড়ছে তা গ্রামের আম-জনতা দেখতে পায়। এক গভীর রাতে গ্রামের দু-একজন নেতার সঙ্গে পুলিশ এসে রবিকে ধরে নিয়ে গেল। রবি নাকি অতি বিপ্লবী। রবি প্রতিবাদী ছিল ঠিকই। নেতাদের অন্যায় কাজকর্মের প্রতিবাদ করত ঠিকই, কিন্তু বোমা-বন্দুক নিয়ে মানুষ মারার মতো জঘন্য কাজ রবি কখনও করতে পারে না— একথা বীণাপানি দেবী ভালই বোঝেন।

আসলে গ্রামের আর সব যুবকেরা রবিকে সমর্থন করতে শুরু করে। অবাধ লুঠপাটের অসুবিধা হতে থাকে নেতাদের, তাই এই ষড়যন্ত্র। একথা গ্রামের সব মানুষই জানে, বোঝে। কিন্তু রবিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রায় ছ'মাস পরে জেলের মধ্যে আটকে থাকা রবিকে চিঠি লেখার এই পরিণাম। একমাত্র সন্তানকে দীর্ঘদিন না দেখে মা বীণাপানি দেবী তার মনের দুঃখ কষ্টের কথা রবিকে লিখেছিলেন। কেমন ভাবে গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, দারিদ্র বেড়ে চলেছে, ঘরের পাশেই তাদের চার বিঘা জমি শ্রমিকের অভাবে চাষ হতে পারছে না। সেসব কথাই লিখেছিলেন বীণাপানি দেবী তাঁর একমাত্র সন্তানকে।

চিঠি লেখার পাঁচদিন পরে গ্রামে বিশাল পুলিশ বাহিনী এল। সঙ্গে ট্রাক্টর, কুলি। এসেই সমস্ত বাড়ি তছনছ করে দিল। পাশের চার বিঘা জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে জমিটাকে চষে ফেলল। পুকুরে জাল নামাল। কয়েক ঘন্টা পরে রবির বৃদ্ধ বাবাকে কয়েকটা চড়-থাপ্পড় মেরে গালি দিতে দিতে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল তারা। অবশ্য যাবার আগে বীণাপানি দেবীর কোলে একটা খাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। খামের উপর লেখা দেখেই বুঝলেন তিনি এটা রবির চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন সেই চিঠি। সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হল বীণাপানি দেবীর কাছে। রবি লিখেছে—

শ্রীচরণেষু মা,

আমি ভালো আছি। জেলে আমার মতো অসংখ্য নিরপরাধ যুবক অপরাধী

হবার শপথ নিচ্ছে। আরও কিছু কথার পরে রবি লিখেছে দোহাই মা, তোমার পায়ে পড়ি, পাশের চার বিঘা জমিতে চাষ করতে যেও না। ওখানে গরু বেঁধো না। ওই জমির নিচে আমি প্রচুর অস্ত্র, গোলা-বারুদ, মাইন লুকিয়ে রেখে এসেছি। চেষ্টা করছি, আমাদের লোকেরা গিয়ে যাতে ওগুলি তুলে নিতে পারে।'

বুঝলেন বীণাপানি দেবী, কেন পুলিশ ট্রাক্টর মজুর নিয়ে তাদের বাড়ি এসেছিল। বীণাপানি দেবী আবার চিঠি লিখলেন ছেলেকে। সব জানিয়ে লিখলেন, কিন্তু সমস্ত জমি ওলট-পালট করে পুলিশ তো কিছুই পায়নি। একটা দো-দমাও পায়নি। কয়েকদিন পর উত্তর এল রবির— 'মা, আমি জানতাম এটাই হবে। আর জেলের ভিতর থেকে এর বেশি কিছু আমি করতেও পারতাম না। এখন তো চার বিঘা জমিটা চাষ হয়ে গেছে। বাবাকে বল, বীজ ফেলতে, বর্ষা নেমে গেছে। ফসল এমনি হয়ে যাবে। সব থেকে পরিশ্রমের জমি চষার কাজটা এখানে বসেই আমি করে দিতে পেরেছি। এটাই তো আমার আনন্দ।

দু'চোখে জল, হাতে রবির চিঠি। হতবাক হয়ে বসে রইলেন বীণাপানি দেবী। বুঝলেন, **কাজ করার ইচ্ছা থাকলে কোথায় আছি, কেমন আছি, কিভাবে আছি সেটা বড় কথা নয়। আসলে চাই কাজ করার সদিচ্ছা।**

মূর্খ-মহামূর্খ

শহরের ধনী অলঙ্কার ব্যবসায়ী বংশীবাবু ব্যবসার কাজে চলেছেন সুন্দরবন অঞ্চলে। এতদিন অলঙ্কার ব্যবসায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন তিনি কাঠের ব্যবসাও শুরু করেছেন। ব্যবসার কাজে প্রায়ই তাঁকে সুন্দরবনের গভীর অঞ্চলে যেতে হয়। জঙ্গলে নানা ধরনের বিপদ-আপদ লুকিয়ে থাকে। সেই কারণে তিনি দু'জন বন্দুকধারী দেহরক্ষী রেখেছেন। জঙ্গলে গেলে রক্ষী দু'জন তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। নৌকা নিয়ে পৌঁছে যান প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তারপর নৌকা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে যে অঞ্চলের জঙ্গল বনদপ্তর থেকে ইজারা নিয়ে ব্যবসা করবেন সেইসব অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া।

একদিন সকালে নৌকা নিয়ে জঙ্গলে পৌঁছে রক্ষী সহ নীচে নামলেন বংশীবাবু। এবার যে জঙ্গলটা ইজারা নিয়েছেন, সেটা তিনি ঠিকঠাক চেনেন না। কাউকে যে জিজ্ঞাসা করবেন এমন কোনও জন-মানুষেরও দেখা নেই। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। হঠাৎ দেখলেন দূরে একজন লোক নদীর জলে হাত-পা ধুচ্ছে। লোকটি জল থেকে উঠে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল। বংশীবাবুও এগিয়ে গেলেন লোকটির দিকে।

ইতিমধ্যে লোকটি তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসা গামছায় বাঁধা জলখাবার খেতে শুরু করেছে। বংশীবাবু লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটি বংশীবাবুকে দেখে খাবার রেখে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসু চোখে বংশীবাবুর দিকে তাকাল। বংশীবাবু তার গন্তব্যের স্থানটি লোকটির কাছে জানতে চাইলেন। লোকটির কাছে জায়গাটির অবস্থান ভালো করে বুঝে নিয়ে যখন যাবার উপক্রম করেছেন, তখনই তার নজর গেল মাটিতে রাখা লোকটির গামছার দিকে। গামছায় রাখা সামান্য জলখাবারের পাশেই পড়ে রয়েছে একটা চক্‌চকে উজ্জ্বল পাথর।

— "আরে এই পাথরটা কোথায় পেলে?" লোকটির কাছে জানতে চাইলেন বংশীবাবু।

"নদীতে বাবু"— উত্তর দেয় লোকটি।

"তুমি এই পাথরটা নিয়ে কি করবে? ৫০ টাকা দিচ্ছি, পাথরটা আমাকে

বিক্রি করে দাও”— বলেন বংশীবাবু।

একটু ভেবে উত্তর দেয় লোকটি— “না বাবু, পাথরটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ছেলেদের দেব। ওরা খেলা করবে।” কিন্তু বংশীবাবু নাছোড়। শেষপর্যন্ত ১০০ টাকার বিনিময়ে লোকটি পাথরটি বিক্রি করতে রাজি হয়। কিন্তু বংশীবাবু ৫০ টাকার বেশি দিতে রাজি নন। অবশেষে লোকটির নামধাম জেনে নিয়ে বংশীবাবু গন্তব্যের দিকে রওনা দেন।

সারাদিনের কাজকর্ম সারা হলে দেহরক্ষীদের নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সকালের সেই লোকটির গ্রামে হাজির হন বংশীবাবু। লোকটির নাম হারান মণ্ডল। পেশা সুন্দরবন্দের জঙ্গল থেকে কাঠ আর মধু সংগ্রহ করা। সামান্য একটা কুড়ুল সঙ্গে নিয়ে এরা বনের ভিতরে প্রবেশ করে। কি ভয়ঙ্কর সাহস এদের! জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ। তার উপরে প্রচণ্ড দারিদ্র্য। পানীয় জলের অভাব। সবকিছু সহ্য করে, মানুষ আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে এরা বেঁচে আছে। এদের জীবনযাত্রা আর জীবনীশক্তির কথা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যান বংশীবাবু। সন্ধ্যার মুখে হারানের বাড়ি পৌঁছে বংশীবাবু দেখেন, বাড়ির বাইরে অনেক লোকজন। সবাই খাতির করে বংশীবাবুকে ভিতরে নিয়ে আসে। ভিতরে এসে বংশীবাবু দেখেন, উঠানে হারান একটা চৌকিতে বসে আছে, আর তাকে ঘিরে অনেক লোকের গুঞ্জন। বংশীবাবুকে নিজের চৌকিটার ওপর খাতির করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে,

“বলেন বাবু, এই অসময়ে গরীবের ঘরে?”

“না হে হারান, তোমার কথাই মেনে নিলাম। তোমাকে ১০০ টাকাই দিচ্ছি। পাথরখানা আমাকে দিয়ে দাও”— বংশীবাবু বলেন।

“পাথর? বাবু, পাথরখানা তো আর নাই, সে তো বিক্রি হয়ে গেছে”— বলে ওঠে হারান।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠেন বংশীবাবু— “বিক্রি হয়ে গেছে? কে কিনল? কত টাকায়?”

হারান বলে— “বাবু আপনি চলে যাবার পর আপনার মতোই আরও একজন ভদ্রলোক এসে লক্ষ টাকায় পাথরখানা কিনে নিয়ে গেলেন।”

“লক্ষ টাকায়! ওরে মূর্খ তুই কি করেছিস তুই জানিস না। মাত্র লক্ষ টাকায় ওটা তুই বিক্রি করলি মূর্খ। জানিস ওটার দাম কোটি টাকা, ওটা পাথর ছিল না,

ওটা ছিল একখণ্ড হীরে, আমি জহুরী, হীরে চিনি, আর তুই মূর্খ! মাত্র লক্ষ টাকায় ওটা হাতছাড়া করলি!”

এতক্ষণ হারান হাঁ করে বংশীবাবুর কথা শুনছিল।

এবার বলে উঠল— “বাবু আমি মূর্খ, পড়ালেখা শিখিনি। সোনা, হীরে চিনি না। তাই না জেনেবুঝে কোটি টাকার জিনিষটা লক্ষ টাকায় হাতছাড়া করেছি। কিন্তু আপনি বাবু, সব জেনেবুঝে মাত্র ৫০ টাকার জন্য কোটি টাকার জিনিসটা হাতছাড়া করলেন? বাবু, আমি মূর্খ হলে আপনি তো ‘মহামূর্খ’।” অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণ গ্রামের হারানের মুখে এই অসাধারণ উত্তর শুনে মুখ নীচু করে বসে রইলেন শহরের ধনী শিক্ষিত বংশীবাবু।

সমাজের শিক্ষিত মানুষ আজকে যদি অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরণ, দুর্নীতি, তোষণের রাজনীতি, সীমান্ত সমস্যা এবং দেশের অন্যান্য বিপদগুলি জেনে বুঝে অন্যকে না জানান, তবে আগামী প্রজন্মও তাদের দিকে নিশ্চিত রূপে মহামূর্খ বলে আঙ্গুল তুলবে।

বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি ঘটনা ও গল্পের সংকলন এই ছোট্ট পুস্তিকা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ও ভাষণে শোনা ঘটনা ও গল্পগুলির প্রকৃত লেখকের নাম না থাকায় এখানেও লেখকের নাম দেওয়া সম্ভব হল না। আগ্রহী পাঠকদের পুস্তিকাটি ভালো লাগলে সংকলকের পরিশ্রম সার্থক হবে।